নকশাল আমলে কলেজ স্কোয়ারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মুণ্ডহীন মূর্তি

সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গে ঝড় তুলেছিল নকশালপন্থী আন্দোলন। এই ঝড় সামলানোর জন্য কলকাতা পুলিশ যে-নীতি গ্রহণ করেছিল তা বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। গ্রন্থটির ভূমিকায় সম্পাদক নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান এবং ওই সময়ের তথ্যমূলক এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন চমৎকারভাবে। গ্রন্থটির আলোচনায় **সন্তোষ রানা**।

পরিপূর্ণ ইতিহাসের কাঠামো

নকশালপন্থী নামে পরিচিত আন্দোলনের প্রথম আট বছর ছিল ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৫। ১৯৬৭ সালের মে মাসে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি থানা ও সন্নিহিত এলাকায় এক বিপ্লবী কৃষক-অভ্যুত্থান ঘটে। অভ্যুত্থানটি স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নামে যে-পার্টি তিন বছর আগে সিপিআই থেকে আলাদা হয়েছিল, সেই পার্টিরই দার্জিলিং জেলা কমিটির কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ওই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন চারু মজুমদার। ওই আন্দোলন সারা ভারতে সিপিআই(এম)-এর কর্মীবাহিনীর মধ্যে এক ভাঙন ঘটায় এবং ১৯৬৯ সালের মে মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী), সংক্ষেপে সিপিআই(এমএল) নামে এক নতুন পার্টি গঠিত হয়। পার্টি গঠনের পর পশ্চিমবঙ্গে আরও কয়েকটি জায়গায় বিপ্লবী কৃষক অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৯-এর শেষে ডেবরা ও গোপীবল্লভপুরের কৃষক অভ্যুত্থান ছিল জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকদের গণ-বিপ্লবী অভ্যুত্থান। কিন্তু ১৯৭০ সালে পার্টি কংগ্রেসের পর সিপিআই(এমএল) ক্রমশ অতি-বাম লাইনের দিকে ঝুঁকতে থাকে। সেই অতি-বাম লাইনের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে কলকাতা শহর ও তার উপকণ্ঠে। স্কুল-কলেজ পোড়ানো ও মূর্তি ভাঙা দিয়ে শুরু হয়ে তা সশস্ত্র বাহিনীর উপর শহুরে গেরিলা আক্রমণে পৌঁছয়। ১৯৭০-এর মে থেকে ১৯৭২-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই কার্যকলাপ এতই বেড়ে ওঠে যে, শহরের মানুষের কাছে নকশালপন্থী আন্দোলন বলতে এগুলোকেই বোঝায়।

উল্লিখিত অতি-বাম কার্যকলাপের মুখে কলকাতা পুলিশ যে-রণনীতি

দ্য নক্সালাইটস থ্রু দ্য আইজ় অফ দ্য পুলিশ
সম্পাদনা:
অশোককুমার মুখোপাধ্যায়
দে'জ পাবলিশিং
কল-৭৩
৩৮০.০০

অতি-বাম লাইনের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে কলকাতা শহর ও তার উপকণ্ঠে। স্কুল-কলেজ পোড়ানো ও মূর্তি ভাঙা দিয়ে শুরু হয়ে তা সশস্ত্র বাহিনীর উপর শহুরে গেরিলা আক্রমণে পৌঁছয়। ১৯৭০-এর মে থেকে ১৯৭২-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই কার্যকলাপ খুবই বেড়ে ওঠে।

গ্রহণ করে, তার কিছু পরিচয় রয়েছে অশোককুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বইটিতে। কলকাতা পুলিশ গেজেটের অনেকগুলি বিজ্ঞপ্তি এর মধ্যে রয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ কীভাবে শহুরে গেরিলাদের মোকাবিলা করছে। তবে সংকলনটিতে নকশালপন্থী ছাড়াও অন্যান্য গণ-আন্দোলন, যেমন সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন বা দেশব্যাপী রেল কর্মচারীদের আন্দোলন দমনে পুলিশের ভূমিকার কিছু কথাও রয়েছে।

ভবিষ্যৎকালের গবেষকরা এখান থেকে শুরু করে হয়তো পরিপূর্ণ ইতিহাস রচনার কাজে হাত দিতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো কয়েক হাজার সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সাহায্যে কলকাতা পুলিশ শহুরে গেরিলা কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। তবে এটা বলতেই হবে, পুলিশের গৃহীত রণনীতির কেবল একটা অংশই পুলিশ গেজেটে ছাপা হয়েছিল, অনেক কিছুই প্রকাশিত হয়নি। যেমন, বেলেঘাটায় চারজনকে গুলি করে মারা, বরানগর-কাশীপুরে গণহত্যা, সরোজ দত্তের গ্রেপ্তার ও হত্যা, এমনকী চারু মজুমদারের গ্রেপ্তার ও পুলিশ লক-আপে তাঁর মৃত্যুর কোনও উল্লেখ পুলিশ গেজেটে পাওয়া যায়নি। এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, এইসব ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা আদৌ আইনানুগ ছিল না, যেমনটা অধিকাংশ সময়েই থাকে না। তাই এগুলো গেজেটে ছাপা হয়নি। এগুলির রেকর্ড কোথাও যদি থেকে থাকে, ভবিষ্যতের গবেষকেরা তা খুঁজে বার করবেন।

যে-সমাজে ব্যক্তি মালিকানা রয়েছে এবং একটি অনুৎপাদক শ্রেণি শ্রমজীবীদের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে, সেখানেই রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান হল পুলিশ, যার মূল কাজ হল শোষণমূলক ব্যবস্থাটিকে রক্ষা করা। একটি ঔপনিবেশিক দেশে পুলিশ অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করে এবং জনগণের কোনও নাগরিক অধিকার থাকে না। ভারতীয় পুলিশ ঔপনিবেশিক আমলের আইন-কানুন ও কাজের ধারা বজায় রেখেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যারা চ্যালেঞ্জ জানায়, তাদের দমন করার জন্য যাকে খুশি ধরা, বিনা বিচারে আটক ও বিনা বিচারে হত্যা করার অবাধ ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিগুলিতে রাষ্ট্রের চরিত্রের এই দিকটিও কিছুটা বোঝা যায়।

সম্পাদক অশোককুমার মুখোপাধ্যায় বইটির একটি ভূমিকা লিখেছেন। ভূমিকাটি সুলিখিত এটুকু বললে কম বলা হয়। চোদ্দো পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে তিনি সিপিআই(এম)-এর মধ্যে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম, নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান, সিপিআই(এমএল)-এর ভাঙন

কানু সান্যাল ও চারু মজুমদার

ভারতীয় পুলিশ ঔপনিবেশিক আমলের আইন-কানুন ও কাজের ধারা এখনও বজায় রেখেছে।

নকশালবাড়ি আন্দোলন সারা ভারতে সিপিআই(এম)-এর কর্মীবাহিনীর মধ্যে এক ভাঙন ঘটায় এবং ১৯৬৯ সালের মে মাসে সিপিআই(এমএল) নামে এক নতুন পার্টি গঠনের পর পশ্চিমবঙ্গে আরও কয়েকটি জায়গায় বিপ্লবী কৃষক অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়ে।

চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। ভূমিকাটি ওই সময়কার এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বইটির সংযোজনী হিসাবে রয়েছে পুলিশের কাছে দেওয়া চারু মজুমদারের ৩১ পৃষ্ঠার বিবৃতি এবং ওই বিবৃতি সম্পর্কে সুনীতিকুমার ঘোষের মন্তব্য। ১৯৭১-এর মার্চ মাস থেকেই আমরা মেদিনীপুরে কর্মরত বাংলা-বিহার-ওড়িশা সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটির সদস্যরা পার্টিতে অনুসৃত অতি-বাম লাইন নিয়ে প্রশ্ন তুলি। ফলত তারপর থেকে চারু মজুমদারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার আগের এক বছর তাঁর সঙ্গে আমাদের সাংগঠনিক যোগাযোগ ছিল না। ফলে, তাঁর বিবৃতির মধ্যে কোনও তথ্যগত অসঙ্গতি আছে কিনা তা আমার পক্ষে বলা কঠিন। তবে তাঁকে যতটুকু চিনতাম বা তাঁর রাজনৈতিক লাইন যেটুকু বুঝেছিলাম তার থেকে মনে হয় বিবৃতির মধ্যে কিছু অসঙ্গতি থাকলেও এর মধ্যে সিপিআই(এমএল)-এর গঠনের সময়কার ইতিহাসের একটা কাঠামো রয়েছে। ভবিষ্যৎকালের গবেষকরা এখান থেকে শুরু করে হয়তো পরিপূর্ণ ইতিহাস রচনার কাজে হাত দিতে পারবেন।